ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক ও কৃষি নির্ভর। সেই কৃষি নির্ভর জীবন গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। এই গোষ্ঠীবদ্ধ সাধারণ মানুষের সৃষ্ট লোকসাহিত্য। সেই সঙ্গে পাশাপাশি শিক্ষিত উচ্চবর্ণের সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা বয়ে চলছিল। সেই সকল গ্রন্থের প্রধান দেবতা হল পুরুষ। লোকসাহিত্য ছিল বস্তুধর্মী। পল্লী বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসার অফুরন্ত নির্ঝর এই সাহিত্যগুলি। লোকসাহিত্য গড়ে উঠেছিল সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত লোকমানসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমনের ফলে এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে ও প্রয়োজনে মঙ্গলকাব্যগুলির সূচনা হয়। এই সময়ে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ও সমাজের কল্যাণে যে সকল দেবী মাহাত্ম্যমূলক গান গীত হত তাই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্ট দেবী মাহাত্ম্যমূলক আখ্যান কাব্য হল মনসামঙ্গল কাব্য। এই দেবদেবী মাহাত্ম্যমূলক কাব্যধারা ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বজায় ছিল। এই কাব্যগুলিতে বিভিন্ন জাতি-বর্ণ ও ধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়া এবং তাদের সংস্কৃতির দীর্ঘ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বহমান। এ ধরনের মঙ্গলকাব্যের শুরুতেই গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা করার পর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, সৃষ্টি রহস্য বর্ণন, মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহ ত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, কৈলাশে হরগৌরীর দাম্পত্য জীবন, মনসা ও চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচারের চেষ্টা, নানাবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে শেষে পূজা প্রচার এবং স্বর্গভ্রষ্ট চরিত্রদের স্বর্গে প্রত্যাবর্তন — এই সকল বিষয় বৈচিত্র্য বর্ণন মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত রীতি। এই সকল বর্ণনার পাশাপাশি বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা ও চৌতিশা ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য বিষয় হিসাবে আসে। এরই সঙ্গে বয়ে চলে সমাজ-জীবনের নানা রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও সংস্কারের বস্তুগত দিকগুলি। মঙ্গলকাব্যগুলি লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের মিশ্রণের ফসল। এর গঠন ও কাহিনীধারায় রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম সংঘাত ও সমন্বয়ের সুর। প্রাচীন ব্রতকথাগুলির যে ধর্মীয় প্রেরণা তাও মঙ্গলকাব্যগুলি সৃষ্টিতে যুক্ত হয়েছে। এই ব্রতকথাগুলি মঙ্গলকাব্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন তুর্কী বিজয়ের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বাতাবরণে অসহায় অবস্থা থেকে ভক্তকে উদ্ধারের জন্য। মঙ্গলকাব্যে এর প্রথম প্রকাশ পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যে। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পরিবর্তনের দেবী-ভাবনা মানুষের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী পাল্টে গেল। সেই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে মাতৃময়ী সমরস আশ্রিত দেবী চণ্ডীর আরাধনা সৃষ্টি হল।

চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ এবং এর অধিষ্ঠাতা হল এই দেবী

চণ্ডী। 'চণ্ডী' — হিমালয় কন্যা, পার্বতীর অপর নাম। 'চণ্ড' শব্দের অর্থ অত্যন্ত কোপন, উগ্র স্বভাব এবং তীক্ষ্ণ। অসুর বধের সময়ে পার্বতীর স্বভাব খুব উগ্র হয়েছিল বলে তার নাম চণ্ডী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের পরিবর্তে যদিও অনেক স্থলে 'সারদামঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল', 'অভয়ামঙ্গল' প্রভৃতি নাম দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল কাব্যকে একটু অন্য ভাবে চণ্ডীমঙ্গলও বলা যেতে পারে। মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ-কুশল। যার উপাখ্যান, কথা, পালা, গান বা জীবনচরিত শুনলে শ্রোতা এবং গায়কের মঙ্গল ও কুশল হয় বা মঙ্গল হবে বলে যা গান করা বা শোনা হয়, তাই মঙ্গলকাব্য। সুতরাং মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গল অর্থে আমরা হিমালয় কন্যা পার্বতীদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়কেই বুঝব।

চণ্ডীমঙ্গলকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে — প্রথম পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিতীয় লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল। পৌরাণিক দেবী মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত। সেখানে সে দেবগণের দুঃখ-দৈন্য দেখে অনেক স্তব-স্তুতি করার পর অসুর বধের জন্য আবির্ভূত হয়। অসুরদের বধ করে দেবগণকে সামান্য কিছু উপদেশ দিয়ে এবং তার মাহাত্ম্য শুনলে জীবগণের দুঃখ-দৈন্য দূর হবে। এইরূপ আদেশ করে সে অন্তর্হিত হয়। মানুষ তাকে পূজা করুক, এ বিষয়ে তার কোন আগ্রহও নেই। লৌকিক চণ্ডী তার বিপরীত। তাকে নিজের পূজা প্রচারের জন্য চিন্তিত ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। মানুষ তার পূজা করতে অসম্মত হলে সে বেশ সাধ্য-সাধনা করে ও ভয় দেখিয়ে পূজা করাতে ব্যস্ত। পৌরাণিক চণ্ডী— দেবী। লৌকিক চণ্ডী কথায় কথায় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানব-চরিত্রের মত আচরণ করে। তার বিবেচনা শক্তি কম। সখী পদ্মা না থাকলে সে অনেক ভুল-ভ্রান্তি করে ফেলত। পৌরাণিক চণ্ডী মানুষের হিতসাধনের জন্য আবির্ভূত, তা সত্ত্বেও সে যেন বাংলার ঘরের চণ্ডী হয়ে উঠতে পারে না। লৌকিক চণ্ডী যেন আমাদের সুখ-দুঃখ, আরাম-বিরাম সকল অবস্থার সঙ্গে বিজড়িত, পৌরাণিক চণ্ডী সেইরূপ হতে পারেন নি। এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী মিশ্রণে উৎপন্ন, যা বাংলাদেশের তথা বাঙালীর নিজস্ব বস্তু। পৌরাণিক চণ্ডী অবিকৃত ভাবে কাব্যে বিরাজমান থাকলে সে মার্কণ্ডেয় পুরাণের স্বরূপ অতিক্রম করে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতে এসে অধিষ্ঠিত হত না। এমন কি বিনা আহ্বানে পচা মাংসের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ কালকেতুর গৃহে আসত না এবং ফুল্লরার সঙ্গে বনে ছাগল চরাতে যেত না। পক্ষান্তরে, পৌরাণিক চণ্ডীকে সাক্ষাৎ পেতে হয় স্তব-স্তুতির মধ্য দিয়ে। লৌকিক চণ্ডী যে খাঁটি পৌরাণিক চণ্ডী নয় তা অনুমান করা যায়। বাংলাদেশে পৌরাণিক ধর্মের অবনতির সময় লৌকিক চণ্ডী নিজ প্রসার বৃদ্ধি করে হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পৌরাণিক ধর্মের আবার যখন সমাদর শুরু হল তখন সেই লৌকিক চণ্ডী নিজেকে দৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। তাই আমরা দেখি 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ' ও 'কালিকাপুরাণ'-এ মঙ্গলচণ্ডীর পূজা এবং

ব্রতবিধি ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কালকেতু ও শালবানের উল্লেখ পাই। এই মঙ্গলচণ্ডীর সমাদর বৃদ্ধি পেল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের মত একঘেয়ে অনুবাদের পাশে।

বস্তুত কোন নতুন ধর্মমত বা দেবীর প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে তাকে লোকরঞ্জন করার প্রয়োজন হয়। অথবা এমন কোন একটা জিনিস থাকা চাই, যাতে লোকের মন আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। নয়তো তা স্থায়ী হতে পারে না। গৌড়ীও বৈষ্ণব ধর্ম প্রেমের মাধুর্যের জন্য সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের অবতার রূপে লোকের পূজা পেয়েছিলেন। তাই মঙ্গলচণ্ডীর সেবকগণ তাকে ভক্তবৎসল করে গড়ে তুলেছেন। যেমন নিজের পূজা প্রচারের জন্য ব্যস্ত, তেমনি ভক্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতেও তৎপর। কালকেতু কলিঙ্গ-কারাগারে তাকে স্মরণ করলে এবং শ্রীমন্ত সিংহলের দক্ষিণ মসানে প্রণের দায়ে ডাকলে সে তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্ধার করেছে। এমনকি ভক্তের জন্য কাক ও কোকিল রূপ ধারণ করেছে, বিভিন্ন অবতার রূপ ধারণ করেছে, গোধিকা হয়েছে, ব্রাহ্মণী ও গ্রাম্যবধূ হয়েছে। চণ্ডীর এই গুণের জন্য বঙ্গবাসী তাকে সাদরে গ্রহণ করে। তার জন্য শৈবসাহিত্য বা শৈবধর্ম ক্রম নির্লিপ্ত হতে শুরু করে। চাঁদ সদাগর, ভাঁড়ু দত্ত ও ধনপতি— এই শিব ভক্তরা বিপদে পড়লে তাকে বিচলিত হতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, ভক্তের প্রতি চণ্ডীর ব্যকুলতা প্রশংসার যোগ্য। তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের জন্ম, বিকাশ ও পরিপুষ্টিও একবারে হয়নি। ব্রতকথার মধ্যেই নিহিত ছিল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বীজ। তারপরে কবির হাতে পড়ে ক্রমে কাব্যে পরিণত হয়েছে। এই কৃতিত্বের প্রথম প্রাপ্য হলেন মানিক দত্ত। তিনি মধ্যযুগে প্রথম পূর্ণাঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঠামো সৃষ্টি করলেন।

চণ্ডীমঙ্গল ধারার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। তবে এই ধারার প্রবর্তক বলা হয়ে থাকে কবি মানিক দত্তকে। তিনি উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের গঠনরীতিকে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন, যা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতির থেকে স্বতন্ত্র। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম রূপ ও গঠনরীতি কীরূপ ছিল, তার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে পরবর্তী কবিদের কৃতিত্ব কতটা তা নতুন করে ও স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

মানিক দত্তের পরবর্তী কবিদের মধ্যে দ্বিজমাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম মুদ্রিত রূপ পাওয়া যায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত গ্রন্থ যা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বহু সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে এবং তাঁকে নিয়ে গবেষণার দিকটি পূর্ব থেকেই সুগম ছিল। অন্যদিকে, দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে প্রথম সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদনা করলেন। তারপর থেকে এই দুই উল্লেখযোগ্য কবিদ্বয়কে নিয়ে অনেকেই গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, চণ্ডীমঙ্গল

কাব্যধারার প্রথম কবি মানিক দত্তের নাম তাঁর পরবর্তী কবিদের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তার কোন সম্পূর্ণ সম্পাদিত বই প্রকাশ হয়নি। তার ফলে অনেকেই মানিক দত্তের অসম্পূর্ণ পুথি লক্ষ্য করে কিংবা তাঁর নামে আঞ্চলিক কিছু লোকপ্রচলিত চণ্ডীর গানের মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে কিছু পুরনো পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে ১৩১১ সালে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় প্রকাশিত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী' প্রবন্ধটি সম্ভবত প্রথম। তিনি কবির আঞ্চলিক পরিচয় এবং ভাষাগত নিদর্শন দেখিয়েছেন। তারপর ঐ 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় প্রায় ছয় বছর পর হরিদাস পালিত লিখলেন 'গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব' নামে একটি প্রবন্ধ। তাতে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বের কথাই বেশি স্থান পেয়েছে। 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 'মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী' নামে ১৩২০ সালে একটি বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ লিখলেন। সর্বশেষে, ১৩৪৫ সালে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় 'মানিক দত্ত ও মুকুন্দরাম' নামে তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তুলনামূলক আলোচনার বীজ বপন করেছিলেন। এঁরা সকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও মালদহের জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে সংরক্ষিত পুথির ভিত্তিতে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত প্রকাশিত হওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে মানিক দত্ত নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও তাঁর সম্পূর্ণ সম্পাদিত গ্রন্থ পাওয়া যায় প্রথম ১৯৭৭ সালে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি সুনীলকুমার ওঝা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা, কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, মানিক দত্তের চণ্ডী, ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্র, ভাষা এবং মানিক দত্ত ও কবিকঙ্কণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে এই সম্পাদিত গ্রন্থটিকে সামনে রেখে আমরা মানিক দত্তের সাহিত্যের দিকগুলি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুণাগুণ এই আলোচনায় গুরুত্ব পায়নি।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি উঠে এসেছে। সেই পটভূমিকায় কীভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি এবং তাতে মানিক দত্তের অবস্থান তুলে ধরতে প্রবৃত্ত হয়েছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি কথা। মধ্যযুগের অধিকাংশ কবিরই জীবন কথা স্বল্পজ্ঞাত। মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যে কবিরা তবুও কিছুটা আত্ম পরিচয় দিয়ে গেছেন। কিন্তু মানিক দত্ত এ ক্ষেত্রে প্রায় নীরব। টুকরো টুকরো দু-চার কথা তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে আছে। এছাড়া মানিক দত্তের জীবন ও কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁর জীবন কথা কিছুটা বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থনারীতি স্থান পেয়েছে। তাঁর

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম রূপটি কেমন ছিল এবং কীভাবে তিনি পরপর ঘটনাকে কাহিনীতে যুক্ত করছেন তার কৌশল-প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় দেবার চেষ্টা রয়েছে। এই কৌশল পরিমাপের জন্য আধুনিক কথাসাহিত্যের প্লটকে মানদণ্ড হিসাবে সামনে রেখেছি। সেই প্রসঙ্গে পুরাণের কিছু সংস্কৃত উদ্ধৃতি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। সেই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে যেগুলির বঙ্গানুবাদ পেয়েছি তা হুবহু সেটাই রেখেছি। এভাবে মানিক দত্তের কাব্যে কাহিনী গ্রন্থনায় লৌকিক ও পৌরাণিক ঘটনাগুলি কতটা ক্রিয়াশীল তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। তা লক্ষ্য করতে গিয়ে নানা সূত্রে সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের দিকগুলি এসেছে। আবার, চতুর্থ অধ্যায়ে চরিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে মানিক দত্তের কাব্যে সৃষ্ট চরিত্রের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল তা আলোকপাত করতে আগ্রহী হয়েছি। চরিত্রগুলিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে তাদের স্বরূপ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে সব ধরনের চরিত্রের অন্তর্গহনের স্বরূপটি তুলে আনা হয়েছে। তা করতে গিয়ে যে সকল উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি তা হুবহু সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে অনুসরণ করে। মুদ্রিত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি চরিত্রের নামে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করি। যেমন এ কাব্যে অধিকাংশ স্থানেই ফুলরা বা কখন ফুলুরা বা কখন ফুল্লরা, আবার খুলনা বা খুলুনা বা খুল্লনা, শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মূল গ্রন্থের এরূপ উচ্চারণ বিভেদ লক্ষ্য করে আমরা প্রচলিত ফুল্লরা, খুল্লনা ও শ্রীমন্ত নামগুলি চরিত্র আলোচনায় ব্যবহার করেছি। তবে উদ্ধৃতিতে নাম পরিবর্তন করা হয়নি। তাঁর কাব্যে এমন কতগুলি চরিত্র ও ঘটনা সন্নিবেশ লক্ষ্য করেছি যা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নেই। সেই দিকটি সামনে রেখে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল্যায়নের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। তাতে কবির চরিত্র রচনায় এবং কাহিনী গ্রন্থনার সঙ্গে অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল ধারার কবিদের তুলনামূলক দৃষ্টিতে আলোচনা করা হয়নি। কারণ তিনি যেহেতু এই ধারার প্রথম বীজ বপন করেছিলেন সেহেতু তিনি বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল কাব্য সৃষ্টির পর একটি সম্পূর্ণ নতুন মঙ্গল কাব্যের ধারায় কি কি দিক তুলে ধরলেন সেগুলিই তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রসঙ্গ ক্রমে নানা স্থানে উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের ধারার সঙ্গে তাঁর কাব্যের সম্পর্ক এবং কবির জন্মস্থান মালদহ জেলার নানা সামাজিক, ধর্মীয় ও বস্তুগত নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর কবিত্বের দিকটি কতটা এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্থান কোথায় তা তুলে ধরা হয়েছে।